বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা

সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস প্রকাশ ঘটেছে সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন সংহত ও উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছে বোধকরি আর কোন ভাষার সাহিত্যে তা হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতসংস্কৃতিকে শুধু প্রকাশিতই করেনি, নিয়ন্ত্রিতও করেছে শত শত বছর ধরে। ভারতবর্ষের ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সমাজিক জীবন এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত ও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যসমূহে বর্ণিত আদর্শের দ্বারা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়মিত হয় যেসব নীতির দ্বারা তারই সাধারণ নাম 'ধর্ম'। এই নীতিসমূহ সংকলিত হয়েছে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি সবই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এই শাস্ত্রগুলিতে জীবনযাত্রার যে আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে নীতিরূপে, সংস্কৃত সাহিত্যসমূহে তাই অঙ্কিত হয়েছে বাস্তব দৃষ্টান্তরূপে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি জীবনের আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানমূলক বিষয়সমূহ; আর সংস্কৃতির অর্থ কৃষ্টি-মানসিক ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ। এক কথায় জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়দিকেরই আচরণ ও পরিমার্জন সভ্যতা-সংস্কৃতির লক্ষ্য। 'সংস্কৃতি' বা কৃষ্টি (culture) কিন্তু সভ্যতার চেয়ে ব্যাপকতর ধারণার দ্যোতনা করে। 'সংস্কৃতি' কোন জাতির বা জনগণের অন্তর্নিহিত জীবনরসে পুষ্ট হয়। তাকে ধার করা যায় না- তা জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। সভ্যতা একটি মহৎ অবদান; কিন্তু 'সংস্কৃতি'

মহত্তর প্রেরণার উপলব্ধি। বংশের পর বংশক্রমে সংস্কৃতির উত্থান ও পতন ঘটে। বৃহত্তর অর্থে ‘সংস্কৃতি’ অবিছিন্ন প্রবাহবিশেষ।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে যার কোন নিশ্চিত তিথি নেই অর্থাৎ আগমনের নিশ্চিত তিথি নেই; অর্থাৎ হঠাৎ ধার্মিক, সত্যোপদেশক, পরোপকারার্থ, সর্বত্র ভ্রমণকারী, পূর্ণ বিদ্বান যোগীরা যখন ঘরে আসেন, তাকে ‘অতিথি’ বলা হয়। এই সম্বন্ধে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে পূর্ণবিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, সত্যবাদী, ছল-কপটরহিত এবং প্রতিদিন ভ্রমণকারী ব্যক্তিই ‘অতিথি’ হিসাবে পরিচিত। গৃহস্থের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ও পরমধর্ম অতিথিসেবা। ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ এ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অতিথির মহত্ত্বের সম্বন্ধে বলেছেন– অতিথি ব্যতীত সন্দেহ নিবৃত্তি হয় না, সন্দেহ নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ় নিশ্চয় তথা প্রমা লাভও হয় না।

ধর্মশাস্ত্রকার মনু অতিথির স্বরূপ বা লক্ষণ নির্দেশ করেছেন –

‘একরাত্রং তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

অনিত্যা হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।’

মনুসংহিতা,(৩.১০২)

অন্যত্র বলা হয়েছে –

‘কুলং ন জ্ঞায়তে যস্য ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ ।

অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথি প্রোচ্যতে বুধৈঃ।।’

যিনি একরাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করেন এরূপ ব্রাহ্মণকে বলা হয় 'অতিথি'। আবার যাঁর বংশ–গোত্রাদি অজ্ঞাত, যাঁর তিথির কোনো বিচার নেই, যে কোনো সময় উপস্থিত হন, তাঁকেও 'অতিথি' বলা হয়।

অমরকোষানুসারে অতিথির পর্য্যায়বাচী শব্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

'স্যাদাবেশিক আগন্তুরতিথির্না গৃহাগতে।'

আবেশিক, আগন্তুক প্রভৃতি শব্দ 'অতিথি' শব্দের পরিপূরক হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্বীকৃত। অভ্যাগত শব্দের দ্বারাও অতিথি অর্থের দ্যোতনা হয়। মহর্ষি শাতাতপের মতে-

'প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খো পতিতো এব বা।

সম্প্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ সর্গসংক্রমঃ।।'

সংস্কৃত সাহিত্যে মানবধর্মের পরিচায়ক বহু আচরিতব্য কর্তব্য বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। 'অতিথি' চরিত্রের উপস্থাপন, তার সেবা সৎকারের মাধ্যমে ভারতীয় মনীষা উজ্জ্বল, উন্নত মনোভূমির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই অতিথি অভ্যাগত প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে কিভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যে বিকীর্ণ মণিমুক্তো স্বরূপ এই সাহিত্যিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির এক সুমহান ভাবধারাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় আলোচ্য নিবন্ধের উপস্থাপন। গৃহে অতিথি সমাগত হলে তার আপ্যায়ণ ও অভ্যর্থনার রীতি আবহমান কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিছিন্ন ভাবধারার অন্তর্গত। এই উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজেও পরিলক্ষিত হয়, তাই একবিংশ শতকের অত্যাধুনিক ভারতবর্ষের বাসিন্দারা প্রতিবেশী দেশ বা সারা পৃথিবী থেকে আগত পরিভ্রমণকারীদের অতিথি

বলেই অভ্যর্থনা জানান। এছাড়া ভারতের এই আতিথ্যবাৎসল্য প্রকাশ পায় স্বমহিমা বিস্তারে গৌরবে উদ্ঘোষিত হয়– 'অতিথি দেবো ভবঃ' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)।

গার্হস্থ্যাশ্রমের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; যেহেতু এই আশ্রমে থেকে গৃহস্থ নিজের বিবিধ কর্মের সম্পাদনা করেন এবং এই ক্রমে গৃহস্থ অনেক প্রকার ভুলত্রুটিও করে ফেলেন। এই সমস্ত ভুলত্রুটি নিবারণের জন্যই পাঁচপ্রকার যজ্ঞের চর্চা করা হয়, যা 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' নামে খ্যাত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও মনুসংহিতা তে এই পঞ্চমহাযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। 'মনুস্মৃতি' তে বলা হয়েছে-

'ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং যথাশক্তি ন হ্যপয়েৎ।।'

অর্থাৎ ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ– এই প্রকার মহাযজ্ঞ আছে, যাদের পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। আলোচ্য নৃযজ্ঞ অতিথিযজ্ঞ নামেও পরিচিত। এই যজ্ঞে অতিথিদের প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিকে দেবতার সমান গণ্য করা হয়- 'সর্বদেবময়োঽতিথিঃ'। অতিথিদের প্রতি গৃহস্থের হৃদয়ে সেবার ভাব উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞের প্রয়োজন।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থের সূনা অর্থাৎ হিংসাস্থান পাঁচটি। যথা– চুল্লী, শিলনোড়া, সংমার্জনী, উদূখলমূষল ও জলকুম্ভ। এগুলিকে নিজকার্যে প্রয়োগ করে গৃহস্থ পাপযুক্ত হয়। এই সব উদ্ভূত পাপ থেকে মুক্তির জন্য মহর্ষিগণ কর্তৃক গৃহস্থদের জন্য প্রতিদিন পাঁচটি মহাযজ্ঞ বিহিত হয়েছে –

‘পঞ্চক্লপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্।।’ (মনুসংহিতা,৩.৬৯)

‘অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তুতর্পনম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।’

(মনুসংহিতা,৩-৭০)

প্রত্যহ প্রত্যেকের অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া উচিত– অন্ততঃ একপাত্র জল দেওয়া কর্তব্য। এর দ্বারাই নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একপাত্র জল থেকে শুরু করে অন্যান্য বস্তু তার প্রয়োজনানুসারে দিতে হবে- এই হল তাৎপর্য্য। শতপথব্রাহ্মণ্যেও পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে প্রাপ্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের মাধ্যমে অতিথিসেবার ধারণাটি প্রাচীন হলেও চিরকালীন। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত শ্লোকটি হল –

‘স্বাধ্যায়েনার্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধিঃ।

পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৃনন্নৈভূতানি বলিকর্মণা।।’

বিশেষতঃ এখানে জীবপ্রেম ও অতিথিসেবাকে যজ্ঞের মর্যাদা দিয়ে প্রাচীন ঋষিগণ অত্যন্ত উদার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ।

ঋগ্বেদের পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগের সমাজভাবনায় অতিথিসেবা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। অথর্ববেদের যুগে গৃহস্থের পারিবারিক জীবনে আতিথেয়তা ছিল অনস্বীকার্য কর্ম। অথর্ববেদে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রয়েছে, যেখানে আতিথ্যের প্রশংসা করা হয়েছে (৯.৬)। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অতিথির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য বা আতিথ্য গৃহকর্মের

এক অবিভাজ্য অংশ ছিল। অথর্ববেদের যুগে প্রত্যেক বাড়িতে অতিথিদের অভ্যর্থনা ও সেবা করা হত। অথর্বসংহিতা এ সম্পর্কে 'আবসথ'এর কথা বলেছেন, কিন্তু অতিথিসেবার জন্য তা আসলে একটি বড় কামরা ছিল কিনা বলা শক্ত। এজাতীয় বাড়ি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর দরিদ্র বৈদিক জনগণের।

কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ শাখার অন্তর্গত কঠোপনিষদে আতিথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ঋষি বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করে যখন দানকার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন সেই সময় পুত্র নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরপ্রদান কালে যমালয়ে পুত্রকে প্রেরণের জন্য বাক্য প্রয়োগ করেন। এমতাবস্থায় নচিকেতা পিতৃবাক্য প্রতিপালনের জন্য যমদ্বারে উপস্থিত এবং সেই সময় যমপুরীতে অনুপস্থিত ধর্মরাট্ যমরাজ। যমের পরিজনেরা আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ, বালক নচিকেতাকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে অতিথি সৎকার করতে চাইলে নচিকেতা গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । যমরাজ প্রবাস থেকে ফিরলে তাঁর পরিজনেরা তাঁকে বলেন –

'বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি , হর বৈবস্বতোদকম্।।' (১.১.৭)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে আসেন, আগুন যেমন তার দাহিকা শক্তির দ্বারা সবকিছু প্রজ্জ্বলিত করে তেমনি অতিথিকে যদি সন্তুষ্ট না করা হয় তাহলে ঘরবাড়ি সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অতিথির সমুচিত সমাদর না হলে গৃহস্থের অকল্যান হয় । মুণ্ডকোপনিষদে আছে –

'যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্।

অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথির্বর্জিতং চ।।' (১.২.৩)

চাতুর্মাস্য যাগের অঙ্গ হিসেবে যদি অতিথিসেবা না করা হয় তবে সেই যজ্ঞের ফললাভ তো হয়ই না উপরন্তু বিপরীত ফলপ্রাপ্তি ঘটে ।

'আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং

চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।

এতদ্বৃঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো

যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।।'

(কঠোপনিষদ ১.১.৮)

অর্থাৎ যার বাড়িতে ব্রাহ্মণ-অতিথি অভুক্ত থাকেন সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির আশা, প্রতীক্ষা, সঙ্গত, সুনৃতা ইত্যাদি লাভ হয় না। এছাড়া ইষ্টাপূর্তাদির ফল, সকল পুত্র ও পশু অর্থাৎ সন্ততি ও সম্পত্তি সমূহ নষ্ট হয়। অতিথি সৎকারে কোন ত্রুটি হলে গৃহকর্তা নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে করতেন। যমরাজ নিজে গৃহকর্তা হিসেবে সেই ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করেছেন। যম নিজে ধর্মরাজ তাই তিনি পাপস্খলনের জন্য তিনটি বর নচিকেতাকে দিতে চাইলেন। সুতরাং অতিথির মর্যাদা কিভাবে দিতে হয় সেই শিক্ষাপ্রদানের জন্যই ধর্মরাজের এই অনুপম আচরণ । যদিও ধর্মরাজ যম বালক নচিকেতার পূজার্হ, কিন্তু যেহেতু তিনি গৃহস্বামী সেহেতু আদর্শ গৃহস্থের ধর্ম যে কি তা নিজে আচরণ করে জগৎ কে দেখালেন।

মহাকবি মাঘবিরচিত 'শিশুপালবধম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ইন্দ্রের অনুরোধে অত্যাচারী শিশুপালকে বধের প্রসঙ্গে নারদ যখন বার্তাবাহক হয়ে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সকাশে উপস্থিত হলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বসে ছিলেন এক উচ্চাসনে। ব্রহ্মজ্ঞানী নারদ শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য এবং তাঁর অতিথি। তাই সম্যক অতিথি সৎকারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই বিনয়প্রদর্শন। এরপর সংসারমহীরুহের বীজস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্যাদিদানে নারদকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্যক অতিথিসৎকার করলেন –

'তমর্ঘ্যমর্ঘ্যাদিকয়াঽঽদিপুরুষঃ সপর্য্যয়া সাধু স পর্য্যপূপুজৎ।' (১.১৪)

অমরকবি কালিদাস বিরচিত সাহিত্যপ্রতিভাতেও বারংবার অতিথি সৎকার ও আতিথেয়তা প্রদর্শন সুচারুরূপে শৈল্পিক ও কাব্যিক আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে তপশ্চরণে ব্যাপৃতা তপস্বিনী পার্বতীও ব্রহ্মচারীকে যথাযোগ্য আতিথ্য প্রদর্শন করেছেন –

'তমাতিথেয়ী বহমানপূর্বয়া সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্বতী।

ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং বপুবিশেষেষ্বতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ।।'

(কুমারসম্ভবম্,৫সর্গ,শ্লোক-৩১)

'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'– প্রবাদের সূত্র ধরেই বলা যায় যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অঙ্কে অতিথিসেবার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে । ১ম অঙ্কে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আগত রাজা দুষ্যন্তকে বৈখানস জানাচ্ছেন যে – কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈব প্রশমনের জন্য পিতা কণ্ব সোমতীর্থে গমন করেছেন এবং মহর্ষির অনুপস্থিতিতে কন্যা শকুন্তলার উপর কণ্ব

অতিথিসেবার ভার ন্যস্ত করে গেছেন। বৈখানস রাজা দুষ্যন্তকে অনুরোধ জানান আশ্রমবাসীর আতিথ্য গ্রহণের জন্য। এখান থেকে খুব স্পষ্টতই বোঝা যায় যে আতিথেয়তা শুধু গৃহীর ধর্মই ছিল না, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে আশ্রমিক পরিবেশে থাকা মানুষেরাও অতিথি সৎকারনামক কর্তব্যটি সুচারুরূপে পালন করতেন। এরপরে ৪র্থ অঙ্কে অতিথিরূপে আগত কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি পতিচিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলা টের না পেয়ে অতিথিবাৎসল্য প্রদর্শনে অসমর্থ হওয়ায় দুর্বাসার অমোঘ অভিশাপে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ জীবন হয় বিড়ম্বিত। এরপরে স্বভাব কুটিল দুর্বাসাকে আতিথ্য প্রদানের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া – প্রিয়ংবদা। তারা পাদ্য ও অর্ঘ্যের দ্বারা দুর্বাসার অভ্যর্চনা করে আশ্রমিক সামাজিকতাকে রক্ষার পাশাপশি শকুন্তলার অপরাধ অপনোদনের চেষ্টা করেন। ৫ম অঙ্কে দুষ্যন্তের রাজসভায় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলাকে নিয়ে উপস্থিত হলে সেখানেও তারা রাজসভার আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিপরায়নতা সার্বজনীন ছিল। আশ্রমের তপস্বী থেকে শুরু করে রাজসভার সদস্য সকলেই অতিথিবৎসল ছিলেন।

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মহারাজ দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করলে রাজাকে মহিষীর সাথে আশ্রমে সমাগত দেখে আশ্রমবাসী ঋষিগণ তাঁদের পরম সমাদরে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করলেন –

'তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্যায় গোপ্তে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ।

অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে।।' (রঘুবংশম্- ১.৫৫)

রাজা ধবলচন্দ্রের মূঢ়মতি পুত্রদের ব্যবহারিক জগতের বৈষয়িক জ্ঞানপ্রদানের জন্য পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা হিতোপদেশ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মিত্রলাভ অংশে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতিথির গুরুত্ব ও অতিথি সৎকারের মার্গনির্দেশ করেছেন। গৃহস্থের ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অতিথি সৎকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে-

'অরাবপ্যুচিতং কার্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।

ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমাঃ।।'

অর্থাৎ শত্রুও যদি বাড়িতে আসে তখন তাকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা উচিত।গাছ-তাকে যে লোক কাটছে তার থেকে ছায়া সরিয়ে নেয় না ।

'যদি বা ধনং নাস্তি প্রীতিবচসাপ্যতিথিঃ পূজ্য এব' – যে ঘরে টাকা-পয়সা নেই, তখন কেবল মিষ্টি কথাতেই অতিথির সেবা করা উচিত।

'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।

এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।'

অর্থাৎ বসার আসন, বিশ্রামের জায়গা, জল – এই তিনটি এবং মিষ্টকথা- এই চতুর্থ জিনিস – এগুলি মহৎ (ভালো) লোকের ঘরে কখনো অভাব হয় না ।

'সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু' – অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে গুরুত্বের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ কারোর গুরু বা পূজনীয় রূপে প্রতিভাত হন কিন্তু গৃহে আগত অতিথি সকলেরই গুরু। অতিথির মহনীয়তা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে গুরু বলে সম্বোধিত করা হয়েছে-

‘উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।

পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্বদেবময়োঽতিথিঃ।।’

অর্থাৎ উত্তম বর্ণের ঘরেও নীচ বর্ণের লোক এলে তার যথোচিত সৎকার করা কর্তব্য। কারণ অতিথি সমস্ত দেবতার মিলিত রূপ। দেবজ্ঞানে অতিথি সৎকার ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। দেবতা যেরকম আপন মহিমায় মানবকুলের পূজনীয়ত্ব লাভ করেন সেইরূপ সকল দেবতার সমন্বিত রূপ হিসেবে অতিথি প্রতিভাত হয়েছেন।

অতিথিসৎকারে ত্রুটি হলে বিপরীত ফল জন্মায়।

‘অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনির্বততে।

স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।।’

অর্থাৎ যার ঘর থেকে অতিথি ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে যায়, সেই অতিথি নিজের পাপ তাকে দিয়ে সেই গৃহস্থের পুণ্য নিয়ে যায়। গল্পের ছলে গার্হস্থ্য ধর্মের সহজপাঠ অতিচমৎকাররূপে বিবৃত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিসৎকার গৃহস্থের একটি অবশ্য করণীয় কর্ম ছিল। রন্ধনকার্য সমাপ্ত হলে প্রথমে বৃদ্ধ, গর্ভিণী, শিশু ও রোগীদের ভোজন করিয়ে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী, অতিথির আগমনের আশায় দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে তবেই নিজেরা আহার্য গ্রহণে উদ্যোগী হতেন। অতিথি সৎকারে ত্রুটি হলে গৃহকর্তা নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে করতেন – তাই প্রাচীন

সংস্কৃত সাহিত্যে বরণীয়, মহনীয়, পূজনীয় চরিত্ররা অতিথিসৎকার রূপ কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে উন্নত আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সাধনে ব্যাপৃত মানব জ্ঞানে-অজ্ঞানে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির সাধন করে তার ফলেই তার প্রার্থিত ইষ্টপ্রাপ্তির পথ অবরুদ্ধ হয় । শাস্ত্রানুমোদিত পথে ধর্মাচরণ, অর্থের উপার্জন ও কামনার প্রশমনে সমর্থ ব্যক্তি প্রকৃতই মুক্তি বা মোক্ষলাভে হয় সমর্থ। এই ধর্মাচরণকে সুসংহত করবার জন্য মনুষ্য জীবনে চতুরাশ্রম ধর্মের পালন উচিত। প্রত্যেক আশ্রমেরই একেকটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কর্তব্যসূচী আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথি ও তার সংস্কাররূপ কর্তব্য কোনো এক বিশেষ আশ্রমের আচরনীয় কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। ব্রহ্মচারী, তপস্বী, গৃহী নির্বিশেষে আতিথ্যগুণের পরিচয় দিয়েছেন। অতিথিবাৎসল্য একটি সার্বজনীন কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। যে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলে আপন আপন ধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তাই সকলেই অতিথিসৎকার কর্মে কখনও কোনো অবহেলা প্রদর্শন করতেন না, আর অবহেলা করলে তার ফলও হতো মারাত্মক তা উদাহরণ সহযোগে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশদে আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিসেবাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন যুগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে সকলেই অতিথিকে অত্যন্ত সমাদরের সাথে গ্রহণ করতেন। অতিথিসেবা ঠিকমতো না হলে অমঙ্গল সাধিত হবে এই ধারণা থেকে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের মানুষ অতিথিসৎকারে হন ব্রতী। পরিবর্তনের স্রোতে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আধুনিক সমাজে লক্ষণীয়। প্রাচীনযুগে মানুষের বিশেষণ রূপে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে 'দেব-দ্বিজ-অতিথিপরায়ণ' অর্থাৎ সজ্জনব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অতিথিপরায়ণতা ছিল প্রকট। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ এখন অতিথিসেবায় আত্মনিবেদনের রীতি থেকে

অনেকাংশে দূরে সরে এসেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অতি মূল্যবান পরম্পরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ অন্তঃকরণ প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম অনুভূতির সহায়তায় বর্তমানে অতিথিপরায়ণতা থেকে হয়েছে ভ্রষ্ট। কেজো সম্পর্কের বাইরে অতিথিবাৎসল্য প্রদর্শন তাই আধুনিক সমাজে নিষ্প্রয়োজনীয়তায় পর্য্যবসিত হয়েছে। আধুনিক ভারতে অভ্যাগতসেবায় যে HOSPITALITY আমরা প্রদর্শন করি তা প্রাচীন সংস্কৃতিরই অনুসরণমাত্র।